দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ

সৈকত চক্রবর্ত্তী

ঔপনিবেশিক শাসনের অভিঘাতে উনিশ শতকের বাংলাদেশে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত একটি মধ্যশ্রেণি গড়ে উঠেছিল। এই মধ্যশ্রেণির হাত ধরে উদারবাদী চিন্তাপুষ্ট নতুন যুগচেতনা অগ্রসর হয়েছিল সমাজ, ধর্ম সংস্কার ও স্বদেশব্রতে। বিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে এই নতুন চেতনার উন্মেষ ও অগ্রসরণের ইতিহাসকে বাংলার 'রেনেসাঁস' আখ্যা দেওয়া হয়ে আসছে। ঔপনিবেশিক শাসনের আগলের মধ্যে এর জন্ম, এই জন্মগত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও আধুনিক বাঙালি মননের ঋণ এর কাছেই। নবজাগরণের প্রথম ভৌগোলিক পরিসর ঔপনিবেশিক শহর কলকাতা। কলকাতার উপকণ্ঠে অবস্থিত রাজপুর-হরিনাভির প্রাচীন জনপদে সেই ঢেউ আছড়ে পড়তে দেরি হয়নি। উনিশ শতকের মধ্যভাগে এই অঞ্চলে নতুন ধরনের স্কুল প্রতিষ্ঠা, মুদ্রণ সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয়, ব্রাহ্মধর্মের অনুপ্রবেশ বাংলার নবজাগৃতির স্থানীয় সংস্করণ তৈরি করেছিল। এই স্থানীয় সংস্করণের নিজস্বতা থাকা স্বাভাবিক, তা নিশ্চয়ই শহর কলকাতার সাংস্কৃতিক জাগরণের প্রতিলিপিমাত্র ছিল না। পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের মতো ব্যক্তিত্বদের মধ্যে মূর্ত হয়েছিল উনিশ শতকের রাজপুর-হরিনাভি অঞ্চলের 'রেনেসাঁস'।

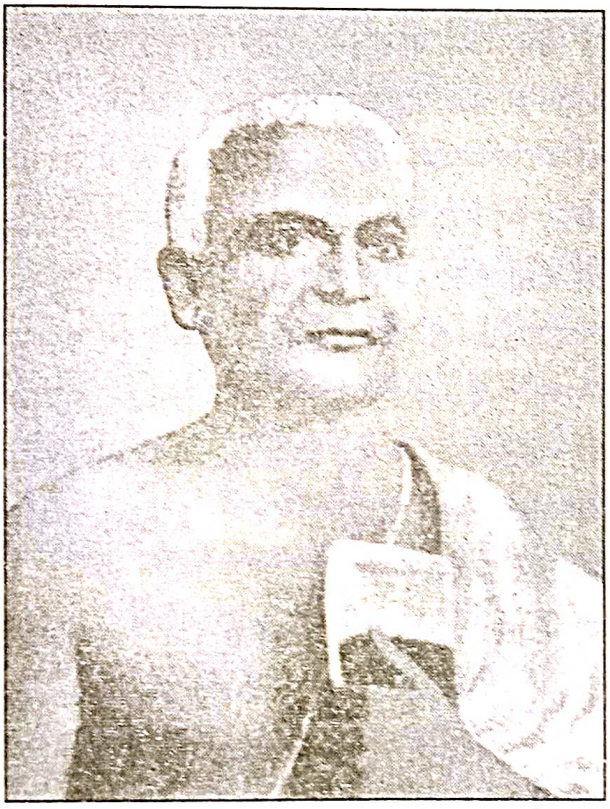

দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ

১৮১৯ সালে রাজপুর-সোনারপুর অঞ্চলে সুভাষগ্রামে (তখনকার চাংড়িপোতায়) দ্বারকানাথ চক্রবর্তীর জন্ম হয়। সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করে ছাত্রবৃত্তি পেয়ে তিনি 'বিদ্যাভূষণ' উপাধি লাভ করেন। দ্বারকানাথ হরচন্দ্র ন্যায়রত্নের জ্যেষ্ঠ পুত্র। সংস্কৃত পণ্ডিত হরচন্দ্রের কলকাতায় টোল-চতুষ্পাঠী ছিল, কলকাতার শিক্ষিত সমাজে সমাদর ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও রামতনু লাহিড়ি তাঁর ছাত্র ছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তর অনুরোধে হরচন্দ্র 'প্রভাকর' সম্পাদনায় তাঁকে সহায়তা করতেন। অর্থাৎ কলকাতা শহরকে ঘিরে যে নতুন সংস্কৃতির উন্মেষ ঘটছিল তা হরচন্দ্রের অভিজ্ঞতার অংশ এবং দ্বারকানাথের সঙ্গে তার প্রথম যোগসূত্র তাঁর পিতা স্বয়ং। ১৮৩২ সালে হরচন্দ্র জ্যেষ্ঠ পুত্রকে কলকাতায় নবপ্রতিষ্ঠিত সংস্কৃত কলেজে ভর্তি করে দেন। তার আগে গ্রামের চতুষ্পাঠীতে দ্বারকানাথ সংস্কৃত শিখেছিলেন। সংস্কৃত কলেজে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন তাঁর সহাধ্যায়ী (*শিবনাথ শাস্ত্রী, 'আত্মচরিত'*)। ঈশ্বরচন্দ্র ও দ্বারকানাথের বন্ধুত্ব আজীবন অটুট ছিল। দু'জনের ভাবনা, উদ্যম ও মানসিক গঠনে সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। সংস্কৃত কলেজের পাঠ শেষ করে ১৮৪৪ সালে দ্বারকানাথ কিছুদিন ফোর্ট উইলিয়ামে ইংরেজ প্রশাসকবর্গের শিক্ষক হিসেবে কাজ করেছিলেন। পরে সংস্কৃত কলেজে পঞ্চাশ টাকা বেতনে ব্যাকরণের শিক্ষক পদে যোগ দেন। বিদ্যাসাগরের অবর্তমানে দ্বারকানাথ সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের দায়িত্বও সামলেছিলেন কিছুদিন। সাতাশ বছর সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা করে ১৮৭৩ সালে তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ সংস্কৃতর পাশাপাশি ইংরেজি ভাষাও আয়ত্ত করেছিলেন। অধ্যাপনাকালে হিন্দু স্কুলের শিক্ষক কৈলাশচন্দ্র বসুর কাছে ইংরেজি শিখতেন তিনি। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন, ব্যক্তিগত উদ্যোগে ভালোমতো ইংরেজি ভাষাজ্ঞানের অধিকারী হয়েছিলেন দ্বারকানাথ (*'মেন আই হ্যাভ সিন'*)।

'সোমপ্রকাশ' দ্বারকানাথের প্রধান কীর্তি। ভূদেব মুখোপাধ্যায় দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণকে বাংলা সাংবাদিকতার শিক্ষাগুরু বলেছেন (*'এডুকেশন গেজেট', ১৯ ভাদ্র ১২৯৩ বাংলা সন*)। অনুরূপ মন্তব্য 'অমৃতবাজার পত্রিকা'-তেও করা হয়েছিল (*'অমৃতবাজার পত্রিকা', ২০ মে, ১৮৭৮*)। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন, ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে 'সোমপ্রকাশে'র অভ্যুদয়ের সময়ে বাংলা সংবাদপত্র সম্বন্ধে একটা অনীহা ছিল, যার কারণ পূর্ববর্তী 'প্রভাকর' ও 'ভাস্করে'র অপযশ। পত্রিকা দুটিতে কোনও রাজনৈতিক বিষয় স্থান পেত না, সামাজিক বা ধর্মীয় বিষয়ও গুরুত্ব দিয়ে লেখা হতনা, শুধু বিশিষ্ট লোকেদের নিন্দাবাদ ও কোনও সামাজিক কাণ্ডের রহস্য আলোচিত হত। ভাষায় পরিশীলন ছিল না। শিবনাথ শাস্ত্রীর ধারণা, ভদ্রসমাজে বাংলা সংবাদপত্রের এই অপযশ দূর করাই 'সোমপ্রকাশে'র জন্মের অন্যতম কারণ ছিল (*'রামতনু লাহিড়ি ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ'*)।

১৮৫৮ সালের ১৫ই নভেম্বর দ্বারকানাথের সম্পাদনায় 'সোমপ্রকাশ' প্রথম প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকা প্রকাশের পিছনে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কিছু ভূমিকা ছিল। সারদাপ্রসাদ নামে একজন পণ্ডিত বন্ধুকে কাজ দেওয়ার জন্য তিনি 'সোমপ্রকাশ' প্রকাশের প্রস্তাব করেছিলেন। ১৮৫৬ সালে দ্বারকানাথের পিতা হরচন্দ্র ন্যায়রত্ন একটি ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেন। স্থির হয়েছিল, দ্বারকানাথ হবেন প্রস্তাবিত সংবাদপত্রের সম্পাদক, তাঁদের ছাপাখানায় সংবাদপত্রটি মুদ্রিত হবে। বিদ্যাসাগর-সহ আরও অনেক পণ্ডিতবন্ধু লিখবেন সেখানে। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন, "কার্যকালে সারদাপ্রসাদ আসিলেন না; অপরাপর লেখকগণও অদর্শন হইলেন, সোমপ্রকাশ সম্পূর্ণরূপে দ্বারকানাথের উপরেই পড়িয়া গেল।" (*'রামতনু লাহিড়ি ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ'*)।

প্রত্যেক সোমবার 'সোমপ্রকাশ' বেরোত। ১৮৬০ ও ১৮৭০-এর দশকগুলিতে 'সোমপ্রকাশ'ই ছিল সবচেয়ে প্রভাবশালী বাংলা সংবাদপত্র। এই কাগজের বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ছিল দশ টাকা এবং তা অগ্রিম দিতে হত। অর্থাৎ সে যুগের হিসেবে দাম ছিল চড়া। টাকা আগে না দিলে কাউকে কাগজ দেওয়া হত না। তা সত্ত্বেও কাগজের গ্রাহক যে বহুসংখ্যক ছিল, সেটি 'সোমপ্রকাশে'র উন্নত মানের পরিচায়ক।

অথচ 'সোমপ্রকাশে' অনেক সময়েই এমন অনেক বিষয় বারবার আলোচিত হয়েছে যা খুবই স্থানীয় বা গোষ্ঠীগত। যেমন দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণদের জন্মের কয়েক মাসের মধ্যেই বিবাহসম্বন্ধ। দিনের পর দিন এর বিরুদ্ধে লিখে গেছেন দ্বারকানাথ। এই গোষ্ঠীগত বিষয়ে মনোযোগ 'সোমপ্রকাশে'র অনেক পাঠকের যে পছন্দ হয়নি তা শিবনাথ শাস্ত্রী জানিয়েছেন (*'মেন আই হ্যাভ সিন'*)। তেমনই রাজপুর-সোনারপুরের বহু বিষয় নিয়ে 'সোমপ্রকাশ' ব্যাপৃত ছিল, যা কলকাতার বৃহত্তর পাঠককুলের কাছে অনাকর্ষণীয়। তা সত্ত্বেও দ্বারকানাথ উক্ত বিষয়গুলির আলোচনা থেকে সরে আসেননি। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন, "তিনি সোমপ্রকাশে যাহা লিখিতেন তাহার এক পংক্তি কাহারও তুষ্টি সাধনের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া লিখিতেন না। লোকসমাজে আদৃত হইবার লোভে লোকের রুচি বা সংস্কারের অনুরূপ করিয়া কিছু বলিতেন না" (*'রামতনু লাহিড়ি ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ'*)। এই ব্যক্তিত্বই ছিল সোমপ্রকাশের প্রাণ। লোকে যখন সোমপ্রকাশ পড়ত তখন এই প্রাণের উত্তাপ অনুভব করতে পারত। দ্বারকানাথ পীড়িত হয়ে পড়ার পর এই কারণেই সম্ভবত 'সোমপ্রকাশে'র জনপ্রিয়তা হ্রাস পায়, তাঁর মৃত্যুর পর এই কাগজ আর তেমন চলেনি।

কলকাতার চাঁপাতলা থেকে প্রথমে 'সোমপ্রকাশ' প্রকাশিত হত। ইস্ট বেঙ্গল স্টেট রেলওয়ের মাতলা সেকশন চালু হল চাংড়িপোতার কাছে সোনারপুরে স্টেশন হয়। চাঁপাতলার বাস উঠিয়ে দ্বারকানাথ চাংড়িপোতা থেকেই সংস্কৃত কলেজে যাতায়াত করতে থাকেন। এই সময় ১৮৬২ সালে তিনি 'সোমপ্রকাশে'র মুদ্রাযন্ত্র চাংড়িপোতায়

নিয়ে আসেন। পরে ১৮৭৫ সালে 'সোমপ্রকাশে'র ছাপাখানা শিবনাথ শাস্ত্রী ভবানীপুরে নিয়ে গিয়েছিলেন (*শিবনাথ শাস্ত্রী, 'আত্মচরিত'*)। মধ্যবর্তী তেরো বছর সেই সময়ের সবচেয়ে প্রভাবশালী বাংলা সংবাদপত্র রাজপুর-সোনারপুর অঞ্চল থেকে বেরিয়েছে— এটা এই অঞ্চলের অধিবাসীদের পক্ষে গর্বের বিষয়।

বাংলাভাষায় 'সোমপ্রকাশ' রাজনৈতিক সাংবাদিকতার জন্ম দিয়েছিল। সমকালীন আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ঘটনাবলি— আমেরিকার গৃহযুদ্ধ, পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে মুক্তি আন্দোলন, পোল্যান্ড ও আয়ারল্যান্ডের স্বাধীনতা আন্দোলন, রাশিয়ায় জারবিরোধী নিহিলিস্ট আদোলন—এসব নিয়ে 'সোমপ্রকাশ' আগ্রহ দেখিয়েছে। বাংলা সংবাদপত্রে এই আন্তর্জাতিকতাবাদ সেই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে এক অভিনব দৃষ্টিকোণ। এর পিছনে ছিল হয়তো দ্বারকানাথের ইতিহাসমনস্কতা। শিবনাথ শাস্ত্রী জনিয়েছেন, ইতিহাস ছিল তাঁর জ্যেষ্ঠ মাতুলের প্রিয় বিষয় এবং তাঁর ইতিহাসজ্ঞান ছিল বহুবিস্তৃত (*'মেন আই হ্যাভ সিন'*)। তবে 'সোমপ্রকাশে'র সবচেয়ে বড় দান, দেশের অর্থনৈতিক পরিবর্তনের দ্বারা দেশের অগ্রগতি বিচারের প্রচেষ্টা। নিঃশুল্ক বাণিজ্যের ফলে ভারতীয় অর্থনীতি যে দুর্বল হয়ে পড়ছে তা তিনি সোচ্চারে বলেছেন, জমিতে কৃষকের সত্বহীনতার সমালোচনা করেছেন, সাম্রাজ্যের স্বার্থে ভারতীয় সেনাদলকে অন্যদেশে পাঠানোর বিরোধিতা করেছেন। আবার রেলপথের প্রসার তাঁকে উৎসাহিত করেছে। সামগ্রিকভাবে দেশের জাগরণের জন্য তিনি বারবার অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতার কথা বলেছেন। পরবর্তীকালে জাতীয় কংগ্রেসের নরমপন্থী রাজনীতিকদের হাতে যে অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের নির্মাণ হয়েছে দ্বারকানাথে শোনা গেছে তার পদধ্বনি। দেশে তুলোর চাষ ও রপ্তানিবৃদ্ধি লক্ষ করে সোমপ্রকাশ লিখেছে, তুলো ইংলন্ডে গিয়ে সুতো ও বস্ত্র হয়ে ফিরে আসছে। এদেশীয়রা তুলোর প্রকৃত ফলভোগী হতে পারছে না—"এদেশে তুলা জন্মিয়া ইংলন্ডে চলিয়া গেল, তাহাতে এদেশের কী শ্রীবৃদ্ধি হইল? এদেশীয়দিগের মজুরিলাভ, ইহাই কি শ্লাঘনীয় শ্রীবৃদ্ধি?" (*'সোমপ্রকাশ, ২ মার্চ, ১৮৬৩,* "ভারতবর্ষের শ্রীবৃদ্ধির প্রকৃত পথ কি?")। এই বক্তব্যই কি পরবর্তীকালে রমেশচন্দ্র দত্ত বা দাদাভাই নৌরজিদের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়নি? দেশের অগ্রগতি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত 'কৃতবিদ্য সম্প্রদায়' থেকেই হবে—এই বিশ্বাস তাঁর ছিল (*সোমপ্রকাশ, ১৫ এপ্রিল, ১৮৭২, 'উচ্চশিক্ষাদানের আবশ্যকতা'*)। ঊনবিংশ শতাব্দীর ছয় ও সাতের দশকে ভারতীয় রাজনৈতিক নেতৃত্বে পুরনো অভিজাত শ্রেণীকে সরিয়ে যে নতুন মধ্যবিত্তের অভিষেক হচ্ছিল, 'সোমপ্রকাশ' ছিল এক অর্থে সেই যুগপরিবর্তনের হাতিয়ার।

মাতলা রেলওয়ে প্রতিষ্ঠার ফলে চাংড়িপোতায় দ্বারকানাথের স্থায়ী বাস রাজপুর-সোনারপুর অঞ্চলের পক্ষে আশীর্বাদস্বরূপ। এই অঞ্চলে দ্বারকানাথের

উদ্যোগে ও 'সোমপ্রকাশে'র সাহায্যে অনেক সংস্কারসাধন সম্ভব হয়েছিল। দেশে ফিরে দ্বারকানাথ হরিনাভি গ্রামে একটি ইংরেজি স্কুল স্থাপন করলেন। ১৮৬৬ সালে কলকাতা ইউনিভার্সিটির ক্যালেন্ডারে 'হরিনাভি স্কুল' বলে স্কুলটি উল্লিখিত হয়েছে, পরের বছর স্কুলের নাম হয় 'হরিনাভি এ এস স্কুল' বা অ্যাংলো সংস্কৃত স্কুল। স্কুলের শতবার্ষিকীর সময়ে স্কুলের নামের সঙ্গে তার বিদগ্ধ প্রতিষ্ঠাতার নামটিও জুড়ে দেওয়া হয়। নতুন নাম হয় 'হরিনাভি দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ অ্যাংলো সংস্কৃত হাইস্কুল'। তবে উনিশ শতকেও রাজপুর-হরিনাভিতে লোকমুখে 'বিদ্যাভূষণের স্কুল' নামেই এর পরিচিতি ছিল (*সোমপ্রকাশ, ৩০ আগস্ট, ১৮৮৬*)। স্কুলটি প্রথমে একটি বাংলা স্কুল ছিল। বিদ্যাভূষণ সংস্কার করে স্কুলটিকে ইংরেজি-সংস্কৃত এন্ট্রান্স স্কুলে পরিণত করেন। প্রতিষ্ঠার অল্প কিছুকালের মধ্যেই স্কুলটি সরকারি অনুদান পেতে শুরু করেছিল, কিন্তু স্কুলের শিক্ষকদের বেতনসহ নানাবিধ খরচ-খরচা ছাত্রদের প্রদত্ত ফি এবং সরকারি অনুদান থেকে মিটত না। দ্বারকানাথ প্রত্যেক মাসেই স্কুলকে অর্থ সাহায্য করতেন। শিবনাথ শাস্ত্রীর সাক্ষ্য অনুযায়ী তা কোনও কোনও মাসে ষাট-সত্তর টাকা পর্যন্ত হত (*'মেন আই হ্যাভ সিন'*)। বিদ্যাভূষণের তখনকার বেতন ছিল একশো পঞ্চাশ টাকা (*শিবনাথ শাস্ত্রী, 'মেন আই হ্যাভ সিন'*)। তা থেকে এই ব্যয় মেটানো প্রায় অসম্ভব ছিল। কিন্তু 'সোমপ্রকাশ' বিক্রির লাভ থেকে বিদ্যাভূষণ সাহায্য পেতেন। তাছাড়া সুন্দরবনে তাঁদের তালুক ছিল। তবে মধ্যবিত্ত ব্যক্তির পক্ষে একটি স্কুলের জন্য মাসিক ষাট-সত্তর টাকা খরচ করা তখনকার দিনে সহজ ছিল না। সারা জীবন দ্বারকানাথ এই স্কুলের ব্যয়ভার বহন করেছেন। বহু কৃতী মানুষ এই স্কুলে শিক্ষালাভ করেছেন ও শিক্ষাদান করেছেন। দেড়শো বছর পেরোনো 'বিদ্যাভূষণের স্কুল' রাজপুর-সোনারপুর অঞ্চলের গৌরবোজ্জ্বল সাংস্কৃতিক ইতিহাসের অন্যতম স্রষ্টা ও লালনকারী।

দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ ও তাঁর ভাগিনেয় শিবনাথ শাস্ত্রীর উদ্যোগে 'সোমপ্রকাশে'র সহায়তায় রাজপুরে ডাকঘর প্রতিষ্ঠিত হয়, রাজপুর মিউনিসিপ্যালিটি গঠিত হয়, রাজপুরে একটি সরকারি চ্যারিটেবল ডিসপেন্সারি খোলা হয় এবং চাংড়িপোতায় স্টেশন (বর্তমান সুভাষগ্রাম স্টেশন) স্থাপিত হয়। রাজপুরে ডাকঘর ও চাংড়িপোতায় স্টেশন স্থাপনের পশ্চাতে দ্বারকানাথের প্রধান ভূমিকা ছিল। তেমনই রাজপুরে মিউনিসিপ্যালিটি গঠন ও সরকারি চ্যারিটেবল ডিস্পেন্সারি খোলার ক্ষেত্রে শিবনাথ নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। সেই সময় যখন দ্বারকানাথ পীড়িত হয়ে কাশীবাসী ছিলেন (১৮৭৩—আনুমানিক ১৮৭৬), 'সোমপ্রকাশ', হরিনাভি স্কুল ও তাঁর পরিবার ও সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়ে গিয়েছিলেন প্রিয় ভাগিনেয়কে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই 'সোমপ্রকাশে'র মাধ্যমে এই অঞ্চলের দাবি-দাওয়া তুলে ধরা হয়েছিল। 'সোমপ্রকাশ' যে উনিশ শতকের ছয় ও সাতের দশকে সরকারেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল তা

শিবনাথ শাস্ত্রী জানিয়েছেন (*'রামতনু লাহিড়ি ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ'*)। ১৮৭৮ সালে ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট চালু হলে দ্বারকানাথ 'সোমপ্রকাশ' বন্ধ করে দিয়েছিলেন। বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নর দ্বারকানাথকে নিজ বাসভবনে ডেকে 'সোমপ্রকাশ চালু রাখার অনুরোধ জানিয়েছিলেন (*শিবনাথ শাস্ত্রী, 'রামতনু লাহিড়ি ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ'*)। কিন্তু মুচলেখা দিয়ে ও হাজার টাকা জামানত রেখে কাগজ চালাতে তিনি অসম্মত থাকেন। এ থেকে বোঝা যায়, সরকারি স্তরে 'সোমপ্রকাশে'র কতটা গ্রহণযোগ্যতা ছিল। সেই প্রভাবকে কাজে লাগিয়ে 'সোমপ্রকাশ' যুক্তিনিষ্ঠ দাবি-দাওয়া পেশ করে রাজপুর-সোনারপুর অঞ্চলে বিরাট সংস্কার সাধনে সহায়ক হয়েছিল। একে যে রাজপুর-সোনারপুর অঞ্চলের নগরায়ণ ও নাগরিক সাংস্কৃতিক উত্থানের ধারাতেও দেখা যেতে পারে সে বিষয়ে সম্প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন ভাস্কর চক্রবর্তী (*প্রবন্ধ 'হরিনাভি স্কুল ও উনিশ শতকের স্থানীয় সমাজ', 'স্কুল ইতিহাসে ও স্মৃতিকথায় দেড়শো বছর' গ্রন্থে*)। এই নগরায়ণের প্রচেষ্টা ও একটি উদারবাদী সংস্কৃতি গড়ে তোলার প্রয়াস আধুনিকায়নের স্থানীয় উদ্যোগকে বৃহত্তর অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ধারার সঙ্গে যুক্ত করেছিল।

পশ্চাদ্গার সামাজিক প্রথা বন্ধ করার ক্ষেত্রেও দ্বারকানাথ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। জন্মের কয়েক মাসের মধ্যেই বিবাহ সম্বন্ধ বন্ধ করার যে কুলপ্রথা দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণদের মধ্যে প্রচলিত ছিল দ্বারকনাথ তা বন্ধ করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। 'সোমপ্রকাশে' এ নিয়ে তিনি দিনের পর দিন লিখেছেন, বিরুদ্ধ মতাবলম্বীদের সঙ্গে তর্কে নেমেছেন। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন, এ বিষয়ে দ্বারকানাথের সাফল্য ছিল আংশিক (*'মেন আই হ্যাভ সিন'*)।

দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ 'সোমপ্রকাশ' ছাড়াও 'কল্পদ্রুম' নামে একটি মাসিক সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। একাধিক সুলিখিত গ্রন্থের লেখক তিনি। তার মধ্যে 'রোমরাজ্যের ইতিহাস' ও 'গ্রীসদেশের ইতিহাস' বাংলায় লেখা এই দুই দেশের প্রথম ইতিহাস-গ্রন্থ। ১৮৫৭ সালে বই দুটি প্রকাশ পায়। লিয়োনার্ড স্মিটজ লিখিত রোম ও গ্রীসের ইতিহাস অনুসরণ করে বই দুটি লেখা। শিবনাথ শাস্ত্রী জানিয়েছেন, ইতিহাস বিষয়ে তাঁর জ্যেষ্ঠ মাতুলের প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল (*'মেন আই হ্যাভ সিন'*)। তাছাড়াও তিনি 'নীতিসার', 'উপদেশমালা', 'সুবুদ্ধিব্যবহার' প্রভৃতি নীতি-উপদেশমূলক গ্রন্থ রচনা করেন। ১৮৭৩ থেকে ১৮৭৫ সালে কাশীতে থাকাকালে সেখানকার অবস্থা বর্ণনা করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা রচনা করেছিলেন। সেগুলি একত্রে 'বিশ্বেশ্বর বিলাপ' নামে একখানি গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। তাছাড়াও তিনি একটি ব্যাকরণগ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সম্পাদিত 'দেবগণের মর্তে আগমন' এবং তাঁর অনূদিত, ভাষ্যকৃত ও সম্পাদিত সটীক 'সংখ্যাদর্শন' প্রকাশিত হয়। 'সোমপ্রকাশ' ও

'কল্পদ্রুমে' তিনি ঋজু সচল বাংলাভাষা নির্মাণে সচেষ্ট হয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর 'সোমপ্রকাশে' লেখা হয়েছিল, "পূর্বের সাহেবি বাংলা, মৈথিলি বাংলা এবং অনুস্বার বিসর্গ বর্জিত সংস্কৃত বাংলা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া সোমপ্রকাশই আধুনিক বিশুদ্ধ বঙ্গভাষার সংস্কার করিয়াছেন। বিদ্যাভূষণ ও তাঁহার পরমবন্ধু বিদ্যাসাগর যদি জন্মগ্রহণ না করিতেন, বঙ্গভাষার বর্তমান উন্নতি আরও একশত বছর দূরে গিয়া পড়িত" (*'সোমপ্রকাশ' ৩০ আগস্ট, ১৮৮৬*)।

১৮৭০-এর দশকের শুরুতেই দ্বারকানাথ পীড়িত হয়ে পড়েন। পীড়া ও ভগ্নস্বাস্থ্যের কারণেই সংস্কৃত কলেজ থেকে অবসর নিতে বাধ্য হন (*শিবনাথ শাস্ত্রী, 'আত্মচরিত'*)। ১৮৮০-র দশকে আরও পীড়িত হয়ে পড়েন। বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত ছিলেন তিনি। জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য বর্তমান মধ্যপ্রদেশের সাতনায় শেষ এক বছর ছিলেন। সেখানেও ওই এক বছরের মধ্যে একটি স্কুলের সংস্কার করেন, একটি নাইট স্কুল স্থাপন করেন, শবদাহস্থান নির্মাণে সচেষ্ট হল। ১৮৮৬ সালের আগস্ট মাসে সাতনাতেই দ্বারকানাথ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুতে সুদূর সাতনার ভদ্রমণ্ডলীও শোকগ্রস্ত হয়েছিলেন।

দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ ছিলেন উদার সহনশীল মানুষ। ভাগিনেয় শিবনাথ শাস্ত্রীর উপবীত ত্যাগ তাঁর অপছন্দ ছিল, কিন্তু সেই শিবনাথের ওপরেই তিনি সবচেয়ে বেশি নির্ভর করেছেন। তিনি ব্রাহ্ম ছিলেন না, তবে আদি ব্রাহ্ম সমাজের প্রতি তাঁর দুর্বলতা ছিল, কিন্তু কেশবচন্দ্র সেনের মুখর সমালোচক ছিলেন। তার জন্য কেশবের অনুগামী শিবনাথ তাঁর স্নেহবঞ্চিত হননি, উমেশচন্দ্র দত্তর স্কুলত্যাগ তাঁকে ব্যথিত করেছিল। ব্রাহ্মদের ওপর দেশীয় সমাজের আক্রমণ তিনি মেনে নেননি। ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করা তাঁর ধাতে ছিল না। রাজনৈতিক বিশ্বাসে তাঁর স্থান হবে নরমপন্থীদের গোত্রে। তিনি রাজদ্রোহী ছিলেন না, কিন্তু বহু বিষয়ে তিনি ছিলেন সরকারি নীতি ও কর্মের সমালোচক। বিদ্যাসাগরের ঐতিহাসিক ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে অমলেশ ত্রিপাঠী ঐতিহ্যসম্মত আধুনিকতার কথা বলেছেন (*'বিদ্যাসাগর দ্য ট্রাডিশনাল মডার্নইজার'*)। এই যুক্তি দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের চরিত্রে আরও সুপ্রযুক্ত। পরম্পরাশ্রিত ধর্মে তাঁর বিশ্বাস ছিল, আবার পরস্পরকে সব সময় মেনেও নেননি। সংস্কৃত পণ্ডিত হয়েও ইংরেজি শিখেছিলেন। টোল-চতুষ্পাঠীর বৃত্তে আবদ্ধ থাকেননি। বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশ করে প্রবলভাবে হাজির থেকেছেন সামাজিক ধর্মীয়-আর্থিক-রাজনৈতিক প্রশ্নে। হরিনাভিতে ইংরেজি স্কুল স্থাপনের দাবি উঠেছিল, কিন্তু ইঙ্গ-বঙ্গ স্কুলে সংস্কৃত শিক্ষা থাকবে না, এ তাঁর মনমতো ছিল না, তিনি অ্যাংলো-সংস্কৃত স্কুল গড়ে তুললেন। দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রকৃত অর্থেই পরম্পরাশ্রয়ী আধুনিক মানুষ।